৭

মুম্বই'তে গত চার পাঁচ বছর হল, রোববারগুলি একেবারেই উপভোগ করিনা। তা সে খাওয়াদাওয়া'ই হোক বা মনের রসদ। রোববারের প্রথাগত সকল আমোদপ্রমোদই যেন কেমন হ্রাস পেয়ে গিয়েছে পুর্বতন সময়ের তুলনায়। রোববারের সকালের বাঙালী জীবনের স্বতন্ত্র প্রতিকস্বরূপ প্রাতরাশে লুচি ও আলুর, কালোজিরে দিয়ে খাঁটি পূর্ববঙ্গীয় সাদা তরকারি তো গত দুতিন বছরে বাড়ীতে একবারের জন্যেও খেতে পেয়েছি বলে মনে পরছেনা। তা রোববারই হোক বা সপ্তাহের অন্য কোন দিন, আমার প্রাতরাশ বলতে এখন হয়, কয়েক টুকরো পাকা পেঁপে ও তরমুজ জাতীয় নিরর্থক কিছু ফলমূল ও অতি ক্ষুদ্রকায় একটি বাটিতে বিস্বাদ খানিকটা সেদ্ধ করা 'ওটস'। এমনকি বছরে হাতেগোনা কটি নিমন্ত্রণ বাড়ী ব্যাতীত রোববারের মধ্যাহ্নভোজটিও আজকাল হয় বেশ হালকা। বড়জোর হয়ত দুমাসে একটিবার কচি পাঁঠার মাংসের একদুই টুকরো পেলেও পেতে পারি। তা'ও ভাত একবারের বেশি চাওয়া চলবেনা ও মাংস রান্নায়ে তেল ও ঝাল তো একেবারেই অননুমোদিত। বিগত কালের রোববারের সকালগুলিতে বা সন্ধ্যের দিকে যেমন রবীন্দ্রনাথের বা বিদেশী গানটান কিছু শুনতাম, সে সব শোনাও তো আজকাল প্রায় একরকমের বন্ধই হয়ে গিয়েছে বলা চলে। পাছে গানবাজনার অত্যাচারে বা আমার উচ্চনিনাদী পাশ্চাত্য রকসঙ্গীতের শ্রবণসুখে বাচ্ছাদুটি'র লেখাপড়ায়ে ব্যাঘাত ঘটে। তা ছাড়া পাশ্চাত্য রকসঙ্গীত এই বয়সে, আমাকে এখন খুব বেশী আর টানেনা।

তদুপরি, রোববারের সকালবেলাগুলিতে এখন নতুন চালু হয়েছে আমাদের এই মুম্বই'য়ের বহুতল বাসাটির অবাঙ্গালী সভ্যসদস্যদের একটি অত্যন্ত মুর্খবৎ অধিবেশন। সেখানে কেবলই শুধু কলের জল, বিজলী ইত্যাদি নিয়ে খামোখা তর্কবিতর্ক, অকারণ বাদপ্রতিবাদ ও জ্ঞানরহিত বৈষয়িক কচকচি। স্থানীয় জমিজমা ও বিভিন্ন রকম ভূসম্পত্তি'র হিসেবনিকেশ ও প্রতি স্কোয়ার ফিটের বর্তমান ও প্রত্যাশিত বাজারদর এইসব একটু আলোচনা হলেই, অসম্ভব রকমের মানসিক তুষ্টি পান আমার মারোয়ারী ও গুজরাটি প্রতিবেশীরা। কিছু দক্ষিনী প্রতিবেশীনী তো আবার রোববারের সকাল সকাল, সম্বর ডাল, রসম ও তেঁতুল সহযোগে ইডলি খেয়ে কোমর বেঁধে ঝগড়াই করতে আসেন বলে মনে হয়। আমি অবশ্য "ঘর জ্বালানি - পর ভুলানি" হয়ে হাসিমুখে বসেই সময় কাটাই। অনেক প্রচেষ্টা করেছি এইসব অধিবেশনে একটু রোববার মার্কা মেজাজ আনতে। অতীতের কয়েকটি রোববার, ওইসকল জমায়েতে বাঙালীসুলভ দু একটি সূক্ষ্ম রসিকতাও করে দেখেছি। আমার মিহি রসিকতায় সকলে কেমন যেন অবোধ ভ্যাবলা কার্তিক হয়ে একে অন্যের মুখের পানে চেয়ে থাকেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, রোববারে আজকাল আমার মনের ক্ষুধাতৃষ্ণা মেটেনা একবিন্দুও। এমনকি আজকাল এই নিদারুন বিতৃষ্ণাজনক প্রবাসে, আনন্দবাজার পত্রিকার 'রবিবাসরীয়'টিও আমাদের বাড়ীতে আসে সোমবারে, রোববার নয়। আর সেদিক থেকে দেখতে গেলে, সোমবার সকালের দিকটিই বরং আনন্দবাজারের রবিবাসরীয়'টি পড়ে রোববারের চেয়ে মন অপেক্ষাকৃত বেশী আনন্দিত হয়ে যায় আমার।

তবে এইতো মাত্র চার পাঁচ বছর আগেও অবধি তো 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সুদূর মুম্বইতে বসেই আমরা পেতাম দিনের দিন। বিক্রিবাটা হিসেব করে, পত্রিকার অফিস'টি বোধহয় এখন উঠিয়েই নিয়েছেন ওঁরা মুম্বই থেকে। ক্লান্তিকর প্রবাসে, রোববারের সকালবেলাগুলি রবিবাসরীয়'টি ঘন্টাদেড়েক ধরে আগাপাশতলা বিস্তারিত পাঠ করে বেশ সুখানুভব করতাম আমি। এখন যেমন করি সোমবারের সকালবেলা'টিতে। আমার রবিবাসরীয় পড়ার ধরণটি সকলের তুলনায় যেন একটু অন্যরকম। রবিবাসরীয় পত্রিকাটি ধরেই প্রথমেই চলে যাই এক্কেবারে শেষ পৃষ্ঠায়ে। বাম দিকের 'মগজ মিটার' নামক অনুবিভাগটিতে। শেষ পাতার মগজ মিটারে ছাপা ওই বর্ণচোরা'টির সমাধান যতক্ষণ না অবধি আমি করতে পারছি, ততক্ষণ একটি বেশ চাপা উত্তেজনা অনুভব করি মনে মনে। যেন কেউ আমাকে যুদ্ধে আহ্বান করেছেন। কোন বর্ণটি লুপ্ত আছে বা কোন লাগসই বর্ণ দিয়ে করে ফেলতে হবে আমার বর্ণচোরাটির রহস্যোদ্ঘাটন, সে নিয়ে প্রায় কমপক্ষে মিনিট দশেক নির্বাহ করি আমি। আবার অকষ্টকল্পিত কিছু বর্ণচোরা থাকলে এক-দু মিনিটেও স্বচ্ছন্দে হয়ে গিয়েছে, এমনও হয় বহুবার। এই তো যেমন গত সপ্তাহের বর্ণচোরা'য়ে 'পরিবেদনা', 'অগ্ন্যুৎপাত' ও 'সংগ্রাহক' শব্দগুলি নিমেষের মধ্যে সমাধান করে

ফেলতে পারলেও, 'ঝনঝনানি' শব্দটি কেন যে মঙ্গলবারের আগে মাথায়ে এলনা কিছুতেই, কে জানে? এ রোববারেও যেমন, 'উচ্চাভিলাষী', 'বেতনভুক' ও 'ক্ষমতাচ্যুত' পেরে গিয়েছি ইতিমধ্যেই। কিন্তু বাকি শব্দটি ('ন য় বি মা') ভোগাচ্ছে এখনও (বাঙালীরা কেউ আবার ইতিপুর্বে পেরে গিয়ে থাকলেও, দুম জানিয়ে দেবেননা যেন আমাকে... কৌতূহল ও কৌতুক এই দুটি নিয়েই তো আছি এই সুদুর প্রবাসে)। তা সে যাই হোক, সত্বর বর্ণচোরা'টির সমস্যাপূরণ করে, সঙ্গে সঙ্গে চোখ চলে যাবে 'চার্লাইন' ও 'পাঞ্চলাইন' এর উপর। শ্রী অসীম চৌধুরী রচিত তিন নম্বর পৃষ্ঠার উপরের দিকে বাঁপাশের চারটি আর ডানপাশের পাঁচখানি ব্যাঙ্গাত্মক ছন্দমিলানো পংক্তি, আমার এককথায়ে অবিশ্বাস্য রকমের ভালো লাগে। ওই দুটি পড়ে, একটু হৃদয়ঙ্গম করেই তারপরে ফের ফিরে যাব শেষপাতায়ে – রোববারের 'আনন্দমেলায়ে'। শেষ পাতায়ে ছাপা বাচ্ছাদের ছোটগল্পটি আমাকে শেষ করে ফেলতে হবে এক নিঃশ্বাসে।

রবিবাসরীয় 'আনন্দমেলা'র পাতাটি ধরতেই প্রতি রোববারই স্মরণে আসতো আমার ছেলেবেলার কথা। রূপকথার ঠাকুরমা'র ঝুলি, ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী, সুয়োরাণী দুয়োরানী ছেড়ে ছেলেবেলায় 'আনন্দমেলা' ধরে ফেলেছিলাম বোধহয় ১৯৭৭ / ৭৮ সাল থেকেই। তবে রবিবাসরীয় আনন্দমেলা পৃষ্ঠাটির উৎস খুঁজতে হলে হয়ত ফেরত যেতে হবে আমার বাবা মায়ের জন্মেরও আগে। ফিরে যেতে হবে আনন্দবাজার পত্রিকার 'রবিবাসরীয়' বিভাগের ইতিহাসে। শুনেছি ১৯৪০ সাল থেকেই রবিবাসরীয়র শেষ পৃষ্ঠায়ে ছোটদের বিভাগটির নাম রাখা হয়েছিল 'আনন্দমেলা'। আর রোববারের সেই 'আনন্দমেলা'র বহুল জনপ্রিয়তাতেই নাকি প্রথমে মাসিক, পরে সাপ্তাহিক ও তার আরও পরে পাক্ষিক 'আনন্দমেলা' পত্রিকা প্রকাশের প্রণোদনা। আর সেই অনুপ্রেরণাতেই আমাদের ছেলেবেলার সাপ্তাহিক আনন্দমেলা পত্রিকাটির জন্ম ১৯৭৫ সালের এপ্রিলে। পরে বই ঘেঁটে জেনেছি, স্বয়ং সত্যজিৎ রায় নাকি এই ছোটদের পত্রিকাটির মাস্টহেডের ডিজাইনটি করেছিলেন। ছোটদের উপন্যাস, গল্প, পদ্য ও কবিতা, রংবেরঙের কমিক্স, খেলাধুলো, ধাঁধা, ভ্রমণ কী না ছিলো আমাদের ওই আনন্দমেলায়ে? সত্যজিৎ রায়ের 'প্রফেসার শঙ্কু', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কাকাবাবু-সন্তু', বিমল করের 'কিকিরা' বা 'ভিক্টর', সমরেশ বসুর 'গোগোল', সমরেশ মজুমদারের 'অর্জুন' ও আমার সর্বাধিক প্রিয় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়'এর ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের গল্প-উপন্যাস। ('ঋজুদার' কথাটি লিখলামনা ইচ্ছে করেই। ওঁর লেখা অনেকের প্রিয় হলেও, একদম ভালো লাগেনা আমার)। শীর্ষেন্দু'র মুখোপাধ্যায়ের কলমে কখনও পড়তে পেয়েছি গোয়েন্দা বরদাচরণ, কখনও ছলচাতুরীহীন গ্রামবাংলা'র আখ্যায়িকা, কখনও অদ্ভুতুড়ে কল্পবিজ্ঞান। কখনও বা আবার নিধিরামের মতন ভালো ভুত, করালীস্যার বা দুঃখবাবুর মতন মাষ্টারমশাই, বা ভজবাবুর মতন ডাকাত। এছাড়াও আরও প্রচুর ভালমন্দ সিঁধেল চোর, ফকিরসাহেব, ব্যায়ামবীর, বৈজ্ঞানিক, ধোবিপাটের প্যাঁচ জানা কুস্তিগীর, অত্যাশ্চার্য ম্যাজিসিয়ান প্রভৃতি চরিত্র নিয়ে বিচিত্র সমস্ত রোমাঞ্চকর কাহিনী। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'রুকুসুকু' ও 'বড়মামা-মেজমামা'র তুলনাহীন সমস্ত কীর্তিকলাপ বা মতি নন্দী'র 'জীবন-আনন্দ'এর মতন আবেগপূর্ণ রচনা বা অনবদ্য নারী ক্রিকেটার 'কলাবতীর' গল্পও খুব পড়েছি আমি। আর আনন্দমেলার কমিক্সের মধ্যে সব থেকে প্রিয় ছিল আমার 'টিনটিন' এবং 'রোভার্সের রয়'। এছাড়াও 'গাবলু' আর শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সদাশিব' তো এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে।

ছেলেবেলায়ে আমি আনন্দমেলার ভক্ত হলেও, আমার গল্পের বই পঠনপাঠনের এক ও একমাত্র সহায় ও পৃষ্ঠপোষক আমার ছোটমাসি 'বন্ধু'টি' কিন্তু পড়তেন মুলত দুটি পত্রিকা। যতদুর মনে পড়ছে, একটির নাম বোধহয় ছিল 'পরিবর্তন' আর অন্যটি 'দেশ'। 'সানন্দা' নামক মেয়েলী পত্রিকাটি তখনও শুরুই হয়নি আর 'আনন্দলোক-উল্টোরথ-প্রসাদ' যতদুর মনে পড়ছে দুচক্ষে দেখতে পারতেননা বন্ধু। দুএকবার 'নবকল্লোল' বা ওই জাতীয় কিছু উলটে পালটে দেখলেও, আর পাঁচটি বাঙালী বুদ্ধিজীবী'র মতন তাঁর মন বোধহয় ভরত কেবলমাত্র 'দেশ' পাঠ করলেই। শ্রী সাগরময় ঘোষের আমলের 'দেশ' যেন ছিল একটি বিশুদ্ধ সাহিত্যানুগ পত্রিকা। (এখন কেন যেন মনে হয়, হর্ষ দত্ত কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের দিকে নজর দিয়ে দিয়েছেন সাহিত্যের চেয়ে সামান্য বেশী)। সালটি সঠিক মনে পরছেনা এখন। তবে আমার ছোটমাসিটিকে যেভাবে গভীর মনোযোগ সহকারে দেশে'র ধারাবাহিক ভাবে বেরনো সমরেশ

মজুমদারের ‘উত্তরাধিকার’, ‘কালবেলা’ ও ‘কালপুরুষ’ পড়তে দেখেছি, তা ভুলবার নয়। বন্ধু’কে আবার সে সময় দেশে’র ওই ধারাবাহিক উপন্যাসের পৃষ্ঠাগুলি ম্যাগাজিন থেকে সাবধানে ছিঁড়ে নিয়ে পরে একত্রে বই আকারে বাঁধিয়ে নিতেও দেখেছি বলে মনে পড়ে। আমিও সেই বাঁধানো দু একটি বই খুলে পড়ার চেষ্টা চালিয়েছিলাম এক দুইবার। সমরেশ মজুমদারের লেখা কিচ্ছুটি হৃদয়ঙ্গম না করতে পারলেও, ‘কালবেলা’র অনিমেষ ও মাধবীলতা যে আমার মাসিটি’কে খুব বেশি রকমের আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, সে বেশ বুঝতে পেরেছিলাম আমি। এছাড়াও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্ধ ভক্ত ছিলেন উনি। পদ্য নয়, উপন্যাসই বেশী পড়তেন উনি। এখনও তেমনই আছেন কিনা জানিনা। তবে সেই সময়ের থেকেই ওঁর সুনীল-অন্ধত্বের ব্যাটনটি যে আমি গত তিরিশ বছর ধরেই বহন করে নিয়ে চলেছি, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

সুনীল তখন লিখতেন দিস্তাদিস্তা। আমার মাসি কিন্তু সেগুলি সব দেশ পত্রিকায়ে না পেলেও, নিয়মমাফিক ভাবে ঢাকুরিয়া রেল লাইন’এর ওপারের একটি লাইব্রেরি থেকে বয়ে নিয়ে আসতেন। সুনীলের আজেবাজে লেখাগুলি পড়েই বলতেন, “কি যাতা লিখছে রে সুনীল গাঙ্গুলী... এক্কেবারে ‘ট্র্যাশ’। খুব বিরক্ত হতে দেখেছি আমি বন্ধু’কে, সুনীলের লেখা যদি তাঁর আশানুরূপ না হত। সুনীলের কালজয়ী উপন্যাসগুলি বাদ রেখে, তাঁর অন্য সব লেখাই কিন্তু আমার অবশ্য চিরজীবনই ভাল বা মোটামুটি লেগেছে। একদম খারাপ লাগেনি কোন লেখাই। সুনীলের অত্যন্ত স্বভাবসুলভ ও স্বাভাবিক ভাবে লেখা কামজ কথাবার্তা আমার পড়তে কেন জানিনা কোনদিনই এককোঁটাও প্রতিবন্ধকতার ছোঁয়া লাগেনি। কত সহজেই সুনীল সরস্বতী ঠাকুরের প্রতি তাঁর জাগতিক ইচ্ছা’র কথা লিখেছেন ‘অর্ধেক জীবন’ নামক আত্মকথনে। ‘সোনাগাছি’ কথাটি’র স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে লিখেছেন এমনই অক্লেশে, যেন যাদবপুর, শ্যামবাজার বা রাসবিহারী’র থেকে সোনাগাছি কোন অংশে অসমান নয়। এমনই তাঁর স্বচ্ছতা। সুনীল কাকাবাবু’র নাম দিয়েছিলেন ‘রাজা’। এমন খেয়ালী সারল্য তো আমি আর কারোর লেখায়ে পেয়েছি বলে মনে পরেনা। নীললোহিতের বারে বারে দিকশুন্যপুরের দিকে বোহেমিয়ান ভবঘুরে’র মতন বেড়িয়ে পড়ার গল্প, সুনীলের বিভিন্ন সময়ে বিদেশ ভ্রমণের পূর্ণবিবরণ, ঐতিহাসিক কথাসাহিত্য ‘সেই সময়’, পার্টিশন ও দুই বাংলা নিয়ে ‘পূর্ব পশ্চিম’ বা ‘প্রথম আলো’র মতন অভূতপূর্ব সাহিত্য কেবল শুধু সুনীলের পক্ষেই রচনা করা সম্ভব। নীললোহিতের বয়েস যে মাত্র সাতাশ বছরের বেশি আজ অবধি হয়নি, এই রকম কিছু সৃজনমূলক মোচড় সুনীল ছাড়া আরও কারো কাছে পাইনি আমি। এই মাঝবয়েসে পৌঁছে বলতে বাধা নেই, রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল ও আরও অনেককে যদি ছেলেবেলায়ে অমিত দাশগুপ্ত স্যার দেখিয়ে দিয়ে থাকেন, তবে ছেলেবেলা থেকে এই বয়েস অবধি সুনীল পড়ার প্রেরণা কিন্তু আমার বন্ধু’ই।

অন্যদিকে, আমার স্বর্গত জ্যাঠামশায়ের ৬৭বি মহারাজা ঠাকুর রোডের বাড়ীতে আমার জ্যাঠতুতো দিদির জন্যে আনন্দমেলা বা আরও অনেক সাময়িকী ধরণের পত্রিকা এলেও, খুব বেশি করে আসতো ‘সোভিয়েত দেশ’, ‘সোভিয়েত নারী’ ও ‘সোভিয়েত ইউনিয়ন’, এই তিনটি পত্রিকা। খামে করে ডাকযোগে আসতো বলে আমার ছেলেবেলায়ে জ্যাঠা’র বাড়ীর ওই পত্রিকাগুলি নিয়ে বেশ কৌতূহলও ছিল বলে এখন মনে পড়ছে। আয়তনে বেশ বড় ছিল সেই পত্রিকাগুলি। আর ছাপার কাগজের প্রকারও ছিল সাধারণ আনন্দমেলা ও দেশ পত্রিকার আদর্শ মান-অনুযায়ী অনেক বেশি উন্নত। কেমন একটু রেশমচিকন কাগজে ছাপা। ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলের পাশে ‘মনীষা’র দোকানে সে বইগুলি আমি ১৯৮৯ / ৯০ তেও শেষবার দেখেছি। আমার বামমনোভাবাপন্ন জ্যাঠামশাই সেই পত্রিকাগুলি বেশ মনোযোগ সহকারেই নাড়াচাড়া করতেন। আর মাঝে মধ্যেই আমাকে ক্রুশ্চেভ - টুস্চেভের নাম নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের ইতিহাস ও ভূগোল বোঝাবার চেষ্টা করতেন। এই মুহূর্তের দিদি ও মোদীর অ-বাম জামানায়ে জ্যাঠার বৈপ্লবিক কথাবার্তা গুলি মনে পরছেনা কিছুই তেমন। তবে ‘বলশেভিক বিপ্লব’ থেকে নিয়ে, সোভিয়েত ইউনিয়নের তৎকালীন কাঠামোয়ে ‘ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ’, ‘রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রন’, ‘ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রের শান্তিপূর্ণ উত্তরণ’, ‘চীনা মডেল’ ও আরও পরে ‘ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শগত সংশোধনবাদ’, ‘গর্বাচেভের পেরেস্ত্রইকা, গ্লাসনস্ত ও আশির দশকের শেষ দিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের

ভাঙন নিয়ে কোন এক রোববার একটু অপ্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক জ্ঞান দেব না'হয়। খুব মনে পড়ছে, ১৯৮০ সালের 'মস্কো'য়ে অনুষ্ঠিত গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকস প্রতিযোগিতাটি তো আমি বেশ ভালরকম অনুধাবন করেছিলাম ওই সোভিয়েত দেশ পত্রিকার রঙীন ছবিগুলি দেখে দেখেই। ১৯৮০ সালের সোভিয়েত ইউনিয়নয়ে তখন ব্রেজনেভের আমল। ভারত সহ আশিটি দেশ 'মস্কো'র গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকসে যোগ দিলেও, আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের আহ্বানে মোট পঁয়ষট্টিটি দেশ যোগ দেননি মস্কো অলিম্পিকসে। কারণস্বরূপ দেখিয়েছিলেন হয় অর্থনৈতিক অসামর্থ্যের যুক্তি (যেটি কিনা বেশ হাস্যকর) নতুবা সোভিয়েত ইউনিয়নের আফগানিস্থানের সঙ্গে তৎকালীন যুদ্ধের বিষয়টি। অবশ্য এই কিছুদিন আগেই কানাডা'র 'মন্ট্রিয়েল' শহরে গিয়ে নিজের চোখে ওখানকার অলিম্পিকস প্রদর্শশালায়ে ঘুরে দেখে এসেছি। ১৯৭৬ এ হওয়া মন্ট্রিয়েল অলিম্পিকসে কিন্তু আসেননি মাত্র হাতেগোনা কয়েকটি আফ্রিকান দেশ। বাকিরা কিন্তু সকলে যোগ দিয়েছিল রীতিমতন হইহই করে।

আফ্রিকার কথা'য়ে হঠাৎ মনে পড়ল, অনেক সৌভাগ্য করে এই মুম্বই'তেই গত ডিসেম্বরের এক রোববারের সকালে শুনেতে পেয়েছি 'ইউনাইটেড নেশনসের' (আন্তর্জতিক জাতিসংঘ) প্রাক্তন মহাসচিব শ্রী কোফি আন্নানের প্রাণবন্ত বক্তৃতা। মুম্বইয়ের একটি পাঁচতারা হোটেলে, মাত্র চারপাঁচ হাত দূরত্ব থেকে শ্রী আন্নানেকে সামনে থেকে তাজা দেখে ও তার সাবলীল বক্তৃতা শুনতে পেয়ে আমার মন বেশ ভালরকমের আলোড়িত হয়ে পড়েছিল সেই রোববার। কি অসীম প্রজ্ঞা, কি অনুত্তেজিত ও ভীষণ শান্ত ভাষণ'টি ছিল তাঁর, সে নিজের কানে না শুনলে বিশ্বাস করা যাবেনা। ইউনাইটেড নেশনসের মহাসচিবের পদ থেকে অবসর গ্রহনের পর ঘানা'র রাষ্ট্রপতির পদ কেন নিলেন না, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আন্তর্জতিক জাতিসংঘ'এর কূটনৈতিক বোঝাপড়া, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন, জর্জ বুশ ও জাঁক সিরাক, মার্গারেট থ্যাচার'এর মতন পৃথিবী'র অন্য আরো অনেক শীর্ষ নেতা বা নেত্রীর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলাপচারিতা, ইরাক, ইরান, মধ্য প্রাচ্য, ভারত, পাকিস্তান, আমেরিকা ও চীনের পারস্পরিক কৌশল ও আরও অনেক বিদেশনীতির কূটনৈতিক বিশ্লেষণ করে বুঝিয়েছিলেন শ্রী আন্নান, ওই রোববার। তবে সবথেকে মনে রাখার মত ওঁর রসবোধ'টি কিছুতেই ভোলা যাবেনা। সেটি একটি ছোট্ট গল্পেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন আন্নান।

ঘটনাটি অনেকটি এইরকম। আন্নান গিয়েছেন ছুটিতে। ইটালি বা ওই ধরনেরই ইউরোপীয় কোন একটি দেশে। এবং বেড়ানোর জন্য বেছে নিয়েছেন, ওঁর স্ত্রী'এরই পছন্দের বিশেষ কোনো পল্লীঘেঁষা জনপদ। ঘটনাটি আন্নানের অবসরের অনেক আগে, নব্বই দশকের একদম শেষাশেষি বা ওই সময়েরই আশেপাশে। আন্নান ছুটির প্রথম কয়দিন সংবাদপত্র ছুঁয়েই দেখেননি একেবারে। স্ত্রী'এর সাথে ছুটি কাটাতে গিয়ে একেবারে অসন্ধিত থাকতে চেয়েছিলেন দৈনন্দিন রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক কার্যকলাপের থেকে। দুই কি তিনদিন বাদে সকালের দিকে একটু সামান্য পায়চারি করতে করতে চলে গিয়েছিলেন একটি গ্রাম্য বাজারে। একটি স্থানীয় সংবাদপত্র কিনে নিয়ে পায়ে হেঁটে ফেরার সময়েই ঘটেছিল নাকি যত বিপত্তি। আন্নান দেখেন কিনা, কিছু না হলেও, ঘটনাস্থলে জনা'বিশেক লোকজন ধেয়ে আসছে তাঁরই দিকে। কাছে এসেই তারা সবাই আন্নান'কে ছেঁকে ধরেছেন অটোগ্রাফের জন্য। তা উনি তখন আন্তর্জাতিক জাতিসংঘের মহাসচিব, জনসাধারণ চিনতে পেরে সই নেওয়ার বায়না ধরতেই পারেন। আর সেই করণে আন্নান কিন্তু ঘাবড়ে যাননি মোটেও। বরং দরকার মত সবাইকে সইসাবুদ দিয়ে খুশি করতে যাবার সময়েই ঘটেছিল নাকি যত বিপত্তি। সেই ইউরোপীয় পল্লীর অধিকাংশ বাসিন্দাই নাকি সই দেখে বিশ্বাস করতেই চাননি, যে উনি কিনা কোফি আন্নান মাত্র... হলিউডের প্রখ্যাত অভিনেতা স্বয়ং 'মরগ্যান ফ্রীম্যান' নন। গল্পটি আন্নান যতই মামুলি ভাবে গল্পচ্ছলে বলে থাকুন না কেন, গল্পটি কিন্তু যতদুর মনে হয়, খাঁটি সত্য। কারণ যেকোনো হলিউডী ছবিতে মরগ্যান ফ্রীম্যান'কে দেখলে, খালি চোখে কোফি আন্নানের সাথে তারতম্য খুব কমই ধরা পড়ে বৈকি।

কোফি সাহেবের বক্তৃতা শুনেই কিনা জানিনা, সেই রোববারে বাড়ী এসেই 'ইউটিউবে' দেখে নিয়েছিলাম আন্নান সাহেবের আরও দুচারটে বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত ভিডিও ও তারই সাথে ক্লিন্ট ইস্টউড ও মরগ্যান ফ্রীম্যানের বিখ্যাত ছবি 'মিলিয়ন ডলার বেবি'। বক্সিং

কোচের ভুমিকায়ে ক্লিন্ট ও একচোখো প্রাক্তন বক্সারের চরিত্রে ফ্রীম্যানের অভিনয় আমার অনবদ্য লেগেছিল ওই রোববারের সন্ধ্যেবেলায়ে। যৌবনে হলিউডী ছবি বেশ কয়েকটি দেখলেও, 'ড্রিউ ব্যারিমোর' ব্যাতীত নায়িকাদের প্রতি মনোযোগ দেইনি কোনকালেই। বরং আকাট আহাম্মকের মতন হলিউডী নায়কদেরকেই অবধান করেছি বেশী বেশী। মিলিয়ন ডলার বেবি ছবিতে কিন্তু ম্যাগী'র চরিত্রে হিলারি স্বাঙ্কের অভিনয়ের অনেক সাধুবাদ প্রাপ্য। তবে অভিনয়ের প্রসঙ্গে বলতে গেলে, অ্যাল প্যাচিনো, নিকোলাস কেজ, টম হ্যাঙ্কস বা মেগ রায়্যান, স্যান্ড্রা বুলকের মত অভিনয় না করতে পারলেও, রিচার্ড গিয়ার এবং সিলভেস্টার স্ট্যালোনকে আমার ভাল লাগত বেশ। অবশ্য যে সময়ে হলিউডী ছবি দুচারটে দেখতাম, তখনকার কথা মনে পরলে এখন নিষ্পন্ন করি যে বর্তমানে বৃদ্ধ ক্লিন্ট ইস্টউডই বোধহয় তখন ছিলেন আমার কৈশোরের হলিউডী আদর্শপুরুষ।

আমার মা তাঁর নিজের যৌবনে বাবার সাথে উত্তম সুচিত্রার বিভিন্ন সিনেমা টিনেমা দেখলেও, ছেলের সিনেমা দেখা পছন্দ করতেন না একেবারেই। পূর্ববঙ্গীয় 'বৈদ্য' বাড়ীর আদর্শস্বরূপ ছেলেপুলেরা নাকি শুধুই লেখাপড়া করবে। আর কোনদিকেই নজর করার পরাক্রম যেন একদম না দেখা যায় বৈদ্য বাড়ীর ছেলের মধ্যে। সিনেমা দেখার অনুমতি ও অকুতোভয়তাও আমার মধ্যে ছিলনা একদম। ছোটবয়সে শনি রোববারের সন্ধ্যের সময়ে দূরদর্শনে দেওয়া সিনেমার সময়ে টিভি তো প্রায়ই বন্ধই করে রাখতেন মা। পাড়ার লোকজনেরা ও বাড়ীর ঝি চাকরেরা আমার মা'কে এই বৈদ্যবাড়ীর রক্ষণশীলতা নিয়ে বেশ গঞ্জনাও দিতেন বলে বুঝতে পারতাম। সিনেমা নিয়ে তো বটেই, আরও কিছু অনাবশ্যক কারণে আমাকে বাড়তি শাসন করতে গিয়ে, গুরুজনদের কাছে আমার মা বেশ ধাতানিও খেতেন বলে মনে পড়ছে। সেই কারণেই ছেলেবেলায় সিনেমা হলে গিয়ে তো বড় পর্দার সিনেমা দেখেছি হাতেগোনা আট দশটি। তা'ও তার বেশির ভাগই অবশ্য আমার ছোটমাসি বন্ধু'র সাথে। আমাদের ছোটবেলায়ে ঢাকুরিয়া বাড়ির কাছাকাছি সিনেমা হল বলতে, খুব সামনেই ছিল আনোয়ার শাহ রোডের 'নবীনা' সিনেমা। নবীনায়ে আসতো মুলত ইংরেজি ছবি (সবগুলি 'বাচ্ছাদের' নয় অবশ্য)। বন্ধু'র সাথে সাঁইত্রিশ নম্বর বাসে চেপে, নবীনায়ে কোনো এক রোববারের ছুটি'র দুপুরের শো'য়ে গিয়ে দেখে এসেছি 'জওস'। স্টিফেন স্পিলবার্গের বিখ্যাত সেই সাড়াজাগানো ছবি সারা পৃথিবীতে ১৯৭৫ এ মুক্তিলাভ করলেও, আমার আর আমার মাসির কিন্তু জওস দেখতে দেখতে হয়ে গিয়েছিল খুব সম্ভব ১৯৮০ / ৮১। এছাড়াও জ্যাঠা, জেঠিমা ও দিদির সাথে 'সাউন্ড অফ মিউজিক' দেখেছি ওই নবীনাতেই। আমার দিদি তো "ডো এ ডিয়ার, এ ফিমেল ডিয়ার..." বা "সিক্সটিন... গোয়িং অন সেভেনটিন" ওই সব গান মুখস্থও করে ফেলেছিল বলে মনে আছে আমার খুব। তবে বন্ধু'কে ছাড়াই 'গুপি গাইন বাঘা বাইন' দেখেছি বাবা মায়ের সাথে। যাদবপুর ছাড়িয়ে গড়িয়ার 'পদ্মশ্রী' সিনেমা হলে। গুপি গাইন বাঘা বাইন পরবর্তী কালে আরও বার বিশেক দেখেছি। তবে ছেলেবেলায়ে দেখা গুপি গাইন বাঘা বাইনের শেষ দৃশ্য'টি রঙিন ছিল, এছাড়া মনে পরছেনা কিচ্ছু।

একটু সামান্য বড় হয়ে, বন্ধু'র সাথেই ছেলেবেলায় দেখা আরও দুচারটি বাংলা ছবি তো ভোলা যাবেনা কিছুতেই। ১৯৮০ কিমবা ৮১'তেই তে ভবানীপুর পাড়ায়ে দেখা 'দাদার কীর্তি', অথবা 'হীরক রাজার দেশে', বাবা মায়ের সাথে দেখা 'ওগো বধু সুন্দরী' ইত্যাদি। তবে বন্ধু'রই সাথে ওই ভবানীপুরেরই কোন একটি হলে, 'ফটিকচাঁদ' দেখতে গিয়ে স্বয়ং বন্ধু'ই খুব বিপাকে পড়ে গিয়েছিলেন। কারণ ফটিকচাঁদ ছবিটি দেখানো হয়েছিল ইন্টারভেলের পর। আর তার আগে চলেছিল সত্যজিৎ রায়েরই রচিত ও পরিচালিত অন্য একটি ছবি। অপর্ণা সেন ও ভিক্টর ব্যানার্জি'র 'পিকু'। বন্ধু নিজে পিকু কতটা দেখেছিলেন বলতে পারিনা, তবে দু একটি দৃশ্যে আমাকে যথাসম্ভব ব্যস্ত করে রাখবার জন্যেই হয়ত আলুর চিপস-টিপস কিনে দিয়ে আমার মনঃসংযোগ অসংহত করে দিতে চেয়েছিলেন। এছাড়াও খুব মনে পড়ছে, কোন এক রোববারের দুপুরবেলায়ে, আমার কচি ভাইটি'কে জেঠিমার কাছে গচ্ছিত রেখে হঠাৎ আমার মা আমাকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন গড়িয়াহাটের 'আলেয়া' সিনেমা হলে আমার জীবনের প্রথম উত্তম-সুচিত্রা'র রোমান্টিক ছবি 'সপ্তপদী'। রোববার তো ছিলই। তাঁর সাথে গরমের ছুটি বা ওই রকমেরই কিছু একটা ছিল হয়ত। সেই রোববারই বোধহয় মায়ের সাথেই বসে প্রথম নিষ্কাম প্রেমের ছবি দেখলাম ('পিকু' কে তো আর সে অর্থে নিষ্কাম বলা

চলেনা!)। সেটি হবে বোধহয় ১৯৮৪, ঢাকুরিয়া ছেড়ে সদ্য বালিগঞ্জের বাড়িতে উঠে এসেছি আমরা।

১৯৮৬ সালে আমার প্রথম স্কুল পালিয়ে সিনেমা দেখা। ক্লাস টেনে'এ পড়ি তখন। সেভেন আর এইট ক্লাসের সংস্কৃত পরীক্ষা চলছিল স্কুলে সেদিন। ওই কারণেই স্কুলে নবম ও দশম শ্রেণি'র ছিল হাফছুটি। ওই হাফছুটি'র ব্যাপারটি আগে থাকতে মা'র কাছে অবিশ্বাস্য নৈপুণ্যের সাথে চেপে গিয়েছিলাম একেবারে। আরও কি? আমাদের মোটা কুন্দ্রা'র ইতিহাস বইয়ের ভিতরে গোপনে লুকিয়ে নিয়েছিলাম মা'র পয়সার বটুয়া থেকে হাতিয়ে নেওয়া একটি কড়কড়ে পাঁচটাকার নোট। আর তার সাথে স্কুলের জামার ভিতরে খুব চালাকি করে সকালবেলাই পড়ে নিয়েছিলাম একটা গোলগলা সাদা পিটি'র গেঞ্জি। দুপুর বেলা হাফছুটির পর তখন আমাকে আর পায় কে? হইহই করে, স্কুলের জামা খুলে বইয়ের ব্যাগে ঢুকিয়ে দিয়ে, কিছু দুষ্টু মতিচ্ছন্ন ছেলেপিলেদের সাথে একদৌড়ে সোজা 'বসুশ্রী'। বসুশ্রী'র সেই নুনশো'তে জ্যাকি শ্রফ ও মীনাক্ষী শেষাদ্রি'র ছবি 'পয়সা ইয়ে পয়সা' দেখতে বসে, ঘনঘন মায়ের মুখ মনে পড়ে এমন উৎকণ্ঠা ও অপরিমিত ঘাম হয়েছিল যে ছবি শেষ হওয়ার ও আলো জ্বলে ওঠার বেশ খানিকক্ষন আগেই আমি সিট ছেড়ে উঠে সোজা বাড়ি চলে এসেছিলাম বলে মনে পড়ছে। আর বাড়ি ফিরে এসেই প্রথমেই স্পষ্টবাক্যে স্বীকারোক্তি মায়ের সামনে, "জানো তো মা, স্কুলে সবাই মিলে বলল বলে, একটা খুব ভাল হিন্দী সিনেমা দেখে এলাম"। মা একটু হতবুদ্ধিই হয়ে পরেছিলেন বোধহয়। ছেলের অত্যধিক সততা দেখে, সেরকম বদ্যিবাড়ী সুলভ বকাঝকাও করতে গিয়েছিলেন ভুলে। তারপরে আর 'সবাইয়ের' নাম জানতে চাইলে, ক্লাসের বাছাবাছা চার পাঁচটি পড়াশুনো'য় ভালো ছেলের নামও বলে দিয়েছিলাম অম্লানবদনে। মনে মনে হয়ত ভেবেছিলাম, "আরে মা... তুমিও খাঁটি বাঙ্গাল বদ্যি হলে, আমিও বাঙ্গাল, আমিও বদ্যি। আর শুধু বাঙ্গাল বদ্যি'ই নই... ধুরন্ধর বেঁটে'ও বটে।

তবে ওইসবের মধ্যেই জীবনে আরও একটা 'সিনেমাটিক' তোলপাড় ঘটে গিয়েছিল। সেটাও ওই ১৯৮৬ সাল নাগাদই হবে। আমার আসানসোলের (সামান্য) দূরসম্পর্কের জ্যাঠতুতো 'দাদাভাইটি' কি একটি কারণে যেন আমাদের বালিগঞ্জের বাড়িতে থেকেছিলেন কিছুদিন। প্রেসিডেন্সি কলেজে ইকোনমিক্স পড়তেন ও মাঝেমাঝে আমাকে স্কুলের ভুগোল ইতিহাস ইত্যাদি পড়াও দেখিয়ে দিতেন। হুট করে একদিন, এক রোববারের দুপুরবেলা, কাউকে কিচ্ছু'টি না বলে, আমাকে একটি ট্যাক্সি করে নিয়ে সটান হাজির হলেন খোদ নিউমার্কেট এলাকার 'গ্লোব' সিনেমা হলে। দাদাভাইয়ের সাথে যাচ্ছি বলে আর দাদাভাইটি পড়াশুনোয়ে উচ্চ ধীশক্তি'র অধিকারী বলে, মা তেমন কোথায়ে যাচ্ছ / কেন যাচ্ছ / কখন ফিরবে গোছের কোন প্রাসঙ্গিক প্রশ্নই করেননি সে রোববার। সেই প্রথম নিউ মার্কেটের 'গ্লোব' সিনেমায়ে দাদাভাইয়ের সাথে দেখে নিয়েছিলাম অস্কার জয়ী হলিউডী ছবি - 'অ্যান অফিসার অ্যান্ড আ জেন্টেল্ম্যান'। সিনেমা'টি মার্কিনী সংলাপ কিচ্ছু বুঝিনি আমি। তবে রিচার্ড গিয়ারের সঙ্গে বিদেশিনী নায়িকাদের চার পাঁচটি বেশ খোলামেলা শয্যাদৃশ্য দেখে ঠোঁটটোট একেবারে শুকিয়ে কাঠ ও কানটান গরম হয়ে একেবারে বেগুনি হয়ে গিয়েছিল।

তবে মাধ্যমিকের পর, টুকটাক তীর্থঙ্কর স্যারের জয়েন্ট এন্ট্রান্সের কোচিং ক্লাস কেটে, ট্রাম ভাড়ার পয়সা জমিয়ে, মাসে একদুই বার ভবানীপুর এলাকায়ে একটা দুটো টালিগঞ্জীয় 'বাংলা' ছবি দেখার শুরু সেই থেকেই। সে সময়ে আমার একেবারেই কাঁচা বয়েস। ছোটবেলা থেকে বেশী গল্পের বই পড়েই কিনা জানিনা, অ্যাকশানধর্মী ছবি ভালো লাগতনা একটুও। এই যেমন একটু তাপস পাল, প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায় মার্কা উষ্ণ বাঙালী আবেগের ছবিই পছন্দসই ছিল বেশি। যেমন নায়ক তার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী প্রেমিকা'র থেকে নিজের মা'য়ের কথা ভাবছেন বেশী বা গানের মাস্টারমশাইয়ের অভিশাপে নায়ক চিরদিনের জন্য ছেড়ে দিলেন তাঁর অতি সখের গানবাজনা, সৎ ও ন্যায়পরায়ণ পুলিশ ইনস্পেক্টরের চাকরি নিয়ে বাঁচিয়ে দিচ্ছেন দরিদ্র বস্তির লোকজনকে... অনেকটা এই ধরণের ভাবোদ্দীপক ও ন্যাকা প্লটগুলিই পছন্দ ছিল বেশী। বর্তমানের তৃণমূল সাংসদ তাপস পাল ছিলেন আমার পছন্দের নায়ক। আর তারপরেই প্রসেনজিত। খুব পছন্দ না হলেও চিরঞ্জিতের ছবিও দেখেছি তখন দু একটি। চিরঞ্জিত নিজে অ্যাকশানধর্মী নায়ক হলেও "বউ মরে গেলে বউ পাওয়া যায় রে ভাই, মা মরে গেলে মা পাওয়া যায়না"...

এই ধরণের ডায়লগ তখন খুবই অনুকরণ করতাম। এমনকি অঞ্জন চৌধুরী'র সংলাপ ধর্মী ছবিগুলিতে অধুনা টালিগঞ্জ পাড়ার নায়িকা কোয়েল মল্লিকের পিতা রঞ্জিত মল্লিক মশাইকেও বেশ ভালই লাগত বলে মনে পরছে। অঞ্জন চৌধুরী'র ছবিতে রঞ্জিত মল্লিকের একটু আমতা আমতা করে বলা আক্রমনাত্মক সব সংলাপ, হতদরিদ্র পিতা বা মৃত্যুপথযাত্রী ঠাকুরদাদার ভুমিকায়ে কালী বন্দোপাধ্যায়ের যখনতখন বুকের বাঁদিকে হাত দিয়ে গোঁগোঁ করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়া, শকুন্তলা বড়ুয়া বা সন্ধ্যা রায়ের সাদা থান পরা দীনহীন বিধবা'র অভিনয়, অনিল কাপুর বা আমির খানের চেয়ে অনেক বেশি প্রিয় ছিল আমার। তখন থেকেই বেশ নজর রাখতাম বাংলা সিনেমা'র পোস্টারের উপর। কি চলছে, উত্তরা – পুরবী – উজ্জ্বলা'য়ে, কোন ছবিটি টানল "দর্পনা – পূর্ণ – প্রাচী", "রূপবানী – অরুনা – ভারতী" বা মিনার – বিজলী – ছবিঘর... এইসব খেয়াল রাখতাম বেশ। তবে, যাতায়াত সীমিত ছিল দক্ষিণ কলকাতাতেই। ওই ভবানীপুরের আশেপাশেই। ১৯৯০ / ৯১ এর আগে নিউ এম্পায়ার, লাইটহাউস, এলিট, জ্যোতি, প্যারাডাইস, ওরিয়েন্ট বা মেট্রো'র ধার দিয়ে যাইনি কোনকালেও।

১৯৯২ থেকে নিয়ে ৯৭ এর ভিতরে মাসে একবার দুবার আমার কলেজ বা অফিসের বন্ধু বান্ধবের সাথে খুব দেখেছি হিন্দী ও ইংরেজি ছবি। তখন কৈশোরের তাপস পাল আর শতাব্দী রায় আর আমাকে টানেননা। হিন্দী ছবির জন্য সর্বোৎকৃষ্ট সিনেমা হলগুলি ছিল দক্ষিন কলকাতার 'বসুশ্রী', 'প্রিয়া' এবং 'মেনকা'। আর মধ্য কলকাতার অফিস পাড়ায়ে, আমার জানার মধ্যে ছিল জ্যোতি, প্যারাডাইস ও ওরিয়েন্ট (উত্তর কলকাতায়ে যেতে একদম পছন্দ করতাম না কিনা!)। হিন্দী ছবিতে আমার সর্বাগ্রবর্তী আকর্ষণ ছিলেন শাহরুখ খান ও কুমার শানু। একমাত্র শানুর কিছু গান অনুকরণ করার জন্যই আমাকে 'ফুল আউর কাঁটে'র মতন ভয়াবহ কিছু ছবি লালমোহনবাবুর মতন কোডোপাইরিন খেয়ে হজম করতে হয়েছিল। গানগুলি তুলেও নিয়েছিলাম অবিকল কুমার শানুর মতন। ফুল আউর কাঁটে'র "প্রেমী আশিক আওয়ারা, পাগল মজনু দিওয়ানা", 'আশিকী' ছবির সবকটি গান, 'দিল হ্যায় কে মানতা নেহি'র গানগুলি ছিল প্রায় ঠোঁটস্থ। শানুর অনুনাসিক কণ্ঠস্বর নকল করে যে তখন কত হাততালি পেয়েছি তা বলে বোঝাতে পারবনা। এখন অনেকেই যখন আমাকে কুমার শানুর নকল করতে বলেন, বেশ বিফল লাগে। মনের মধ্যে কপি করতে পারলেও, বয়সজনিত কারণে ঠোঁটে গিয়ে পেস্ট করতে গিয়ে কিন্তু ভালরকমের অকৃতকার্য হই। শাহরুখ খানকে ভাল লাগলেও, শুধুমাত্র শানুর গানের জন্যেই আমির বা সলমনের তারুণ্যপূর্ণ ও জ্ঞানহীন কিছু প্রেমের ছবি দেখেছি সে সময়ে। তবে আমির ও সলমনের চেয়ে শাহরুখ খানের সমাদর আমার কাছে সামান্য বেশী হলেও, সেটি উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই নয় আজকের দিনে।

অফিস পাড়ার সিনেমা হলগুলি বিখ্যাত ছিল ইংরেজি ছবির জন্য। মনে পড়ছে, বিশেষ করে নিউ এম্পায়ার, লাইটহাউস বা মেট্রোয়ে ঘন ঘন আসতো জ্যাকি চ্যান, স্টিভ ম্যাকুইন, আর্নল্ড শোয়ার্জেনেগার, সিলভেস্টার স্ট্যালোন বা আমার প্রিয় ক্লিন্ট ইস্টউডের মারদাঙ্গার ছবি। অফিসের বন্ধুবান্ধব ছাড়াও তখন আমার সমবয়েসী মামা নিলাঞ্জন ও আমার একসময়ের অভিন্নহৃদয় বন্ধু চিরদীপের সাথে 'রকি' বা 'র‍্যাম্বো' আমি দেখেছি বহুবার। ক্লিন্টের ছবির মধ্যে আমার মনে খুব ধরেছিল, 'আউট'ল জোসি ওয়েলস, 'দি গুড দি ব্যাড অ্যান্ড দি আগলি', 'ডারটি হ্যারি', 'হ্যোয়ার ঈগলস ডেয়ার'... ইত্যাদি। আর এইসব অ্যাকশানধর্মী হলিউডী ছবিটবি দেখেই আমার মামা নিলাঞ্জন ও আমার হাঁটাচলা ও কথাবার্তায়ে বেশ একটি পুরুষালী রুপান্তরও দেখা দিয়েছিল। কিন্টের মতন রিভলভার চালাতে না পারলেও, দুজনে রাত জেগে চুরুট-টুরুট টেনেও দেখেছি বারকয়েক। এবং কিছুতা হলেও, আমার নকল করার ফিচেল স্বভাব'টির জন্যই কিনা জানিনা, মার্কিনী না হলেও, সাধারণ ইংরেজি'তে সে সময়ে অনায়াসে কথাবার্তা চালিয়ে যেতে পারতাম বন্ধুবান্ধবের সাথে ও অফিসকাছারি'তে।

তখন নিজেকে খুব সেয়ানা ভাবতাম। আর সম্প্রতি এই মধ্য জীবনে পৌঁছিয়ে আমার এই সমস্ত অতিবাহিত অতীত ভাবতে বসলে নিজেকে এখন মনে হয় নিখাদ গোমূর্খ। এই যেমন ইংরেজি ছবি দেখে গড়গড়িয়ে ইংরেজি কথা বলার পূর্বদৃষ্টান্তটির কথাই ধরা যাক। ওই যৌবনের পটভূমিতে যেমন আমার বিশ্বাস ছিল যে আমার সমবয়স্ক ও সমমনোভাবাপন্ন বাঙালী ছেলেপুলেদের মধ্যে, কিছু না হলেও, ইংরেজি বলার ব্যাপারটিতে যেন আমিই সবার সেরা। একেবারে

নজিরবিহীন যাকে বলে। বুঝতে ভুল করেছিলাম যে চারটি ক্লিন্ট ইস্টউডের ছবি দেখে নিয়ে চুরুট খাওয়া শেখা গেলেও, খোদ মার্কিনী বোধহয় হয়ে যাওয়া যায়না চট করে। আমার ইংরেজি ভাষা সংক্রান্ত সব দর্প, সব তেজ, সব আত্মাভিমান একেবারে ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গিয়েছিল ২০০০ সালের আমেরিকা যাত্রায়। শুধুমাত্র ইংরেজি কথা বোঝা ও বলার বিষয়েই রোববারের এক সন্ধ্যেবেলাতে বশ মেনেছিলাম ফিলাডেলফিয়াতে।

সেই দুহাজার সালের জানুয়ারি মাসের ষোলো তারিখ, রোববার রিটেনহাউস স্কোয়ারের 'করমানসুইটস হোটেলের এপার্টমেন্টটিতে ঢুকেই দেখি একটি হলদেটে রঙের একটি ছোট্ট কাগজ। দরজার নিচেই, গালিচার উপরে পরে আছে অযত্নে। কেউ একজন কিছু হিজিবিজি লিখেও রেখেছেন কালো কালিতে। খুব একটা আমল না দিলেও ছিঁড়েও ফেলিনি আমি কাগজটি। ঘরে আসবার পথে করমানসুইটসের অভ্যর্থনা কক্ষে আমার ক্রেডিট কার্ডের মতন দেখতে এপার্টমেন্টটির চাবি গ্রহন করার সময়েই আমাকে বলেছিলেন ওই মেমসাহেবটি। আমার মুখ দেখেই হয়ত মুহূর্তে বুঝে গিয়েছিলেন যে আমি তার কথাগুলির মর্মগ্রহণ করতে পারিনি কিছুই। বারংবার বলছিলেন "ভয়েস মেল ভয়েস মেল" আর একদুই বার বলেছিলেন 'স্টিকি' শব্দটি। ক্লিন্ট ইস্টউডের ছবিতে ভয়েস মেল আর স্টিকি শব্দদুটি শুনিনি কিনা... সে কারণেই আমিও অবোধের মতন গা করিনি খুব একটা। মাথায়ে তখন একটিই কথা ঘুরছিল। মা'কে আর বউকে একটু যে ভাবেই হোক ফোন করে পৌঁছসংবাদ জানিয়ে দিতে হবে শীঘ্র। আমি বরং অভ্যর্থনা কক্ষের মেমসাহেবটিকে আন্তর্জাতিক ফোনের নিয়মকানুন ও খরচাপাতির বিষয়ে করেছিলাম অনেক প্রশ্ন। আর তারপরেই এপার্টমেন্টের ভিতরে এসে সবকিছু দেখেশুনে বিমুঢ় হয়ে পরেছিলাম। ভবানীপুরের সিনেমা হলের বাংলা ছবির মতন ভাবপ্রবণ হয়ে ভাবতে বসেছিলাম, কাশফুলের মাঠ, প্রথমবারের জন্য রেলগাড়ি দেখতে পাওয়া অপু'র সাথে দুর্গা'র দৌড়, বালিগঞ্জ ফাঁড়ি'র বিকেলের চায়ের দোকান, বাবার সাথে হাত ধরে রোববারের ঢাকুরিয়া বাজার পরিক্রমা, রোববারের সকালের স্টেটসম্যান পাঠ, সুনীল – শক্তি, আমার পদ্যলেখা। ও তারই সাথে আমার মা আর ইট রঙের শাড়ী পরিহিতা জীবনসঙ্গিনীটির কথা। তারপরে ইলেকট্রিক ওভেনে খিচুড়ি রান্না করতে করতে মেমসাহেবের পইপই করে বলে দেওয়া ভয়েস মেল বা হলুদ স্টিকির বিষয়গুলি মাথা থেকে একরকম উবেই গিয়েছিল।

আমাদের ভারতীয়দের যেমন একটি করে ভাল নাম আর একটি (বা অনেক'কটি) ডাকনাম, তেমন ব্যবস্থা আমেরিকায়ে নেই। ভালনামের মধ্যেই বিলকুল লুকিয়ে আছে তার ডাকনামটি। আরও কি... নাম ও পদবীর মধ্যেও নেই কোন অমিল। এই যেমন কোনও আমেরিকান পুরুষের নাম 'স্মিথ' হলে অন্য একটি পুরুষ বা মহিলার পদবী কিন্তু হতেই পারে স্মিথ। কেবল স্মিথ নয়। স্মিথ, অ্যান্ডারসন, মিলার, টেলর, জনসন, উইলিয়ামস, মাইকেল, এডওয়ার্ড, ক্রিস্টোফার ইত্যাদি... এসব যে কোন আমেরিকানের নামও হতে পারে আবার পদবীও হতে পারে। এমন মজাদার ব্যাপার যদি আমাদের ঘটত? ভাবা যায়, মধ্যপ্রদেশ বা মহারাষ্ট্রের কোন শহরে বা গ্রামে, কোন লোকের নাম কি হতে পারে 'দাশগুপ্ত সিং' বা 'দাশগুপ্ত দেশপান্ডে'? আবার শুধু নাম ও পদবীর নকড়া-ছকড়াই শেষ নয়। ডাকনামের মধ্যেও লুকিয়ে আছে আরও অনেক ধাঁধা ও এলোমেলো রহস্য। কিছুই জানতাম না আমি... আউট'ল জোসি ওয়েলসে আমার হিরো ক্লিন্ট'কে দেখেও কিছুই উন্নতিলাভ করা হয়নি আমার। আর নিজের ইংরেজি ভাষার অসম্পূর্ণতা বুঝে, তখন শুধু একটিই ভরসা, তূণে রাখা আমার শেষ বাণটি। আমার হার না মানা জেদ ও ক্রমাগত অনুকরণ করে যাওয়ার ক্ষমতা। সে ক্ষমতায়ে অফিসে যাওয়ার আগে শুধু একটি নামই শিখতে পেরেছি ততক্ষণে। ফিলাডেলফিয়া'কে মার্কিনীরা ছোট করে বলেন 'ফিলি'। সাহেব মেমেরা করমানসুইটসের প্রাতরাশ টেবিলে কফি পান করতে করতে সকলেই বলাবলি করছিলেন কিনা 'ফিলি'তে আজ দুপুরে তুষারপাতের সম্ভবনা। আর ঠিক তখনই ঝটিতি তুলে নিয়েছিলাম ফিলাডেলফিয়ার সুশ্রাব্য ডাকনামখানি। আর সামান্য পারস্পরিক সামঞ্জস্যের হিসেব রেখে তখনই মুহূর্তে উপলব্ধি করে নিয়েছি ফিলি শহরের আমাদের কোম্পানী'র ঠিকানাটি 'ইলেভেন পেন সেন্টার' কেন? ফিক্ করে হেসে নিজেকে নিজেই গালি দিয়ে বলেছিলাম, শালা! উদো কোথাকার! এটাও বুঝতে এত

সময় লাগল? 'পেনসিলভানিয়া' রাজ্যের নাম থেকেই এসেছে 'পেন' শব্দটি। এই পেন কথাটিও একটি মিষ্টি মার্কিনী ডাকনাম বই কিচ্ছু'টি নয়।

ভল্লুকের মতন দু'দুখানি ফুলহাতা সোয়েটার চাপিয়ে, তার উপরে কোট, পেন্টুল আর টাই'এর ধড়াচুড়ো পরে, মাইনাস সাত ডিগ্রি'র তাপমাত্রায়ে দিশাহারা বাঙালী দরিদ্র যুবকটি অফিস কিভাবে পায়ে হেঁটে পৌঁছেছিল, একটানা কনকনে হিমেল হাওয়া আর তুষার ঠেঙ্গিয়ে তার গল্প এখানে আর ফাঁস করা যাচ্ছেনা। কারণ সে গল্প বড়ই লজ্জার ও বড়ই ব্যাক্তিগত। তবে এটুকু প্রকাশ করতে পারি যে ফিলি'তে সকাল আট'টা নাগাদ, সুবিশাল চওড়া রাস্তায়ে আমি নিজেকে ছাড়া আর হাঁটতে দেখিনি কাউকে। রাস্তার দুধারে রাতের সদ্য পড়া তুষার। কালো কাঁচতোলা ইয়া লম্বালম্বা গাড়ীর ভিতর থেকে মার্কিনী অফিসযাত্রীরা আমাকে যে একপ্রকার বদ্ধউন্মাদ ভেবেছিলেন এ ব্যাপারে কোন সন্দেহই নেই আমার। তবে পথে কিন্তু ঠাণ্ডা লাগেনি এমন কিছু আমার। একটি অদ্ভুত হুজুগ ও ভীষণ প্রকোপণে বড় অধীর লেগেছিল। ফিলাডেলফিয়া'র মার্কেট স্ট্রীটে অবস্থিত ইলেভেন পেন সেন্টারের তিরিশতলা স্কাইস্ক্রাপার'টির অভ্যন্তরাভিমুখে অমন ঠাণ্ডার মধ্যে দিয়ে বেশ খানিকটি হাঁটার জন্যেই কিনা জানিনা, মাথাটি ঝট ঘুরে গিয়েছিল একবার। তা সে আমিও পোড় খাওয়া বাঙ্গাল, বদ্যি আর একইসঙ্গে বেঁটেও...সামলেই নিয়েছিলাম অবহেলে।

পেন সেন্টারের অফিসে গিয়ে প্রথমেই দেখা করার কথা ছিল 'এইচ-আর' এবং 'প্রশিক্ষণ' বিভাগে। যথাক্রমে অ্যালেক্সা হ্যামিল ও বারবারা পটার নামের দুটি মেমসাহেবের সাথে। একে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রথমেই দেখা হয়ে গিয়েছিল বারবারা'র সাথে। প্রথম সাক্ষাতে মিসেস পটার বলবো নাকি মিস পটার, এই নিয়ে একটু দোনোমনো হয়েছিল বটে আমার মনে। তা সে সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে আটপৌরে "গুড মর্নিং" দিয়েই শুরু করছিলাম আমি। আর তারপরেই বারবারা নামটি সম্পর্কিত প্রসঙ্গভূত বিষয় আসাতেই, মহিলাটি বলেন কিনা, "কল মি বার্ব... জাস্ট বার্ব..."। ভেবেছিলাম ঝেড়ে দিই একখানা বাছা ক্লিন্টসুলভ সংলাপ। তারপরেই সামলে নিয়েছিলাম নিজেকে। দাবা খেলার কিস্তি অত সহজে হয় নাকি? নিজেকে সংযত করে আস্তে আস্তে শুরু করলাম আমার অননুকরণীয় অনুকরণ বিদ্যা। তারই দু চারখানা ঝলক দেকিয়ে তার পরের দু সপ্তাহেই শিখে নিয়েছিলাম পশ্চিমী নাম নিয়ে অজস্র নিয়ম কানুন। কিছু নিয়ম ছিল বেশ সহজ। যেমন অ্যান্ড্রু'কে ডাকতে হবে অ্যান্ডি। কিন্তু সবই আবার অ্যান্ড্রু আর অ্যান্ডি'র মতন অনুবন্ধিত নয়। যেমন কিনা বেঞ্জামিন'কে যদি ডাকা হয় 'বেন', ব্র্যাডলি'কে 'ব্র্যাড', সেই নিয়মে অগাস্টিন'কে 'অগা' বলে ডাকলে বা অ্যামান্ডা'কে আমু-টামু বললে সাঙ্ঘাতিক বিপদের আশঙ্কা আছে। অ্যামান্ডা'কে নিয়ম করে বলতে হবে 'ম্যান্ডি' ও অগাস্টিন'কে কেবলমাত্র ছোট্ট করে 'গাস' ডাকলেই চলবে। ডগলাস'কে 'ডাগ' বা ডোনাল্ড'কে 'ডন' ডাকা যেতে পারে। কিন্তু ভুলেও ডমিনিক'কে 'ডোম' বলে ডেকে অযথা অপমান করতে যাওয়াটি উচিত হবেনা। কারণ ডমিনিক'কে আমেরিকায়ে সকলে কেবলমাত্র 'নিক' বলে জানে কিনা। শুধু এই নয়, আরও ভয়ঙ্কর কিছু আছে। এডওয়ার্ড'কে কিছু লোকজন বিলেতে 'এড' বলে ডাকলেও, মার্কিন দেশে তার আসল ডাকনামটি কিন্তু হবে 'টেড'। টেডে'র প্রেমিকা অবশ্য তাকে আদর করে বলতেই পারে 'টেডি'... কিন্তু আবার আমার মত ভেতো বাঙালী বা খয়েরী চামড়ার ভারতবাসী 'টেডি' নামটি বললে এডওয়ার্ড কিন্তু চটে গিয়ে দিয়ে ফেলতে পারেন কিছু বাছা বাছা মার্কিনী কুবচন। হেনরি'কে বলা হবে হ্যারি, কিন্তু আবার একইসঙ্গে এলিজাবেথ'কে ব্রিটিশদের মতন 'এলি' বলতে গেলেই বিপদ। আমেরিকায়ে ওই এলি'রই সঠিক ডাকনাম হবে 'লিসা' বা 'বেটি'। মার্কিনী নামবাচক বিশেষ্যের আরও নমুনা ও সতর্কীকরণ এরকম আছে গাদা গাদা। কিন্তু তাঁর জন্যে শুধু অনুকরণ করলেই হবেনা, একটু অনুসরণও চাই। তা সে যাই হোক, আমেরিকান নামাবলীর অনর্থক গালগল্প না করে বরং আসল গল্পটিতেই আসি।

পেন সেন্টারের পঁচিশ তলায় আমার পরবর্তী বৈঠক'টি ছিল অ্যালেক্সা হ্যামিলের সাথে। আর সেখানেই ঘটেছিলো চরম বিপত্তি। একটু সৌজন্যমুলক কথাবার্তা বলেই অ্যালেক্সা আমার সাথে আলাপ করিয়ে দিলেন আমার 'সেক্রেটারি' লিন্ডা'র সাথে। সিরিঙ্গে সেই লিন্ডা নামক মহিলা'টির বয়েস তখন হবে প্রায় পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই। আর এদিকে সেজে এসেছেন একদম একটি কুড়ি বছরের যুবতী মেয়ের ন্যায়। দুই আঙ্গুলেই লম্বালম্বা নখ,

বিভিন্ন নখে আবার ভিন্ন ভিন্ন রঙের নখপালিশ (পরে বুঝেছিলাম ওগুলি সব নকল)। পরিচয়প্রদান ও কিছু উপক্রমণিকা হওয়ার সাথে সাথে তো একপ্রকার ধমকেই দিয়েছিলেন আমাকে লিন্ডা। কারণটি আর কিছুই নয়। আমার ভয়েস মেল বক্সে নাকি পড়ে রয়েছে মোট সতের'টি বার্তা। তারমধ্যে একদুই খানি তাঁর নিজের দেওয়া হলেও, বাকি সবই নাকি আমার ম্যানেজার'এর, যার নাম কিনা অ্যাডাম কিগলি (তারও ছোটনাম কি একটি ছিল, এখন ভুলে মেরে দিয়েছি)। অ্যাডাম নাকি নিজে করমানসুইটসে গিয়েছিলেন আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে। এপার্টমেন্টে আমাকে খুঁজে না পেয়ে, আমার ঘরের দরজার উপরে সাঁটিয়ে দিয়ে এসেছিলেন একটি হলুদ রঙের স্টিকি। স্টিকির উপরে লিখেছিলেন কিছু অফিস সংক্রান্ত নির্দেশ। সেগুলি'র বিষয়ে অবশ্য লিন্ডা নাকি কিছুই বিশেষ জানেননা। মুহূর্তের মধ্যে আমার মনে পড়ে গেল করমানসুইটসের অভ্যর্থনা কক্ষের মেমসাহেবটিকে। একটু ত্রস্ত হয়ে পড়েছি দেখে, লিন্ডা'ই তৎক্ষণাৎ কথা বলিয়ে দিলেন আমার ম্যানেজার'টির সাথে। তা কথা বলেই বুঝলাম যে অ্যাডাম আমার ভারতীয়সুলভ দায়িত্বজ্ঞানহীনতা দেখে বড়ই খাপ্পা। আমার পাসপোর্ট নম্বরটি নাকি তার ভীষন প্রয়োজন বিমানের টিকিট কিনতে, আর আমিই কিনা তাঁর ধরাছোঁয়ার বাইরে? পাসপোর্ট, বিমানের টিকিট ও নতুন ম্যানেজারের ত্রাসে মনের মধ্যে সব কেমন যেন জগাখিচুড়ি পাকিয়ে গিয়েছিল। তবে অ্যাডাম যা তথ্য ও সংবাদ দিলেন, তাতে প্রকাণ্ড এক বাজ ভেঙ্গে পড়ল আমার মাথায়ে। আমাকে নাকি আজই সন্ধ্যের ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের বিমান ধরে পৌঁছে যেতে হবে 'অর্লান্ডো' আর তারপরে সেখান থেকে গাড়ী চালিয়ে যেতে হবে অর্লান্ডো থেকে মাত্র আশি মাইল দূরের 'ফ্লোরিডা পাল্ম কোস্ট' নামক একটি জায়গায়ে। গাড়ী চালানোর কথাতেই আমি স্নায়বিক হয়ে পড়েছিলাম বেশী। তাছাড়া টিকিট পাব কোথায়ে? ডলারই বা কে দেবেন আমাকে? এই প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন আমার মাথায়ে ঘুরছে কেবল। এদিকে আমি সশঙ্ক হলেও, উল্টোদিকে লিন্ডাকে দেখি ফ্লোরিডা ও অর্লান্ডোর নাম শুনে তার তো আনন্দই থামেনা। পাল্ম কোস্টে যাব শুনে নিজেদের লাগামছাড়া মার্কিনী ভাষায়ে আমাকে 'লক্ষ্মীমন্ত' বা 'পয়মন্ত' এইসব বলেটলে খুব মঙ্গলকামনা করেছিলেন তিনি। আর তদুপরি, তাঁর ভারতীয় সাহেবটি (অর্থাৎ কিনা এই অধম) কিনা ফিলি'র বাইরে চলে যাবেন টানা তিন সপ্তাহের জন্য। গাড়ী চালানোর প্রাথমিক ভয় কাটিয়ে আমি লিন্ডাকে দেখেই তখন আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছিলাম। আরও অনুপ্রাণনা পেলাম যখন কিনা আমার পাশের ক্যাবিনে বসা জ্যানেট নাম্নী সুন্দরী মেয়েটি এসে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন জানুয়ারী মাসের ফ্লোরিডায়ে তাপমাত্রা সত্তর থেকে আশি ডিগ্রির মধ্যে। জ্যানেটের সামনেই মুহূর্তে সি বাই ফাইভ ইকুয়াল টু এফ মাইনাস থার্টিটু বাই নাইন করে বুঝে নিলাম উনিশ থেকে একুশ ডিগ্রি'র মতন হবে। তাপমাত্রার হিসেব কষে তাও একটু সাময়িক শান্তি পেলাম মনে। এবার করমানসুইটসে ফিরে জিনিসপত্তর গোছানোর পালা। তারপরেই আবার মালপত্তর নিয়ে দৌড়তে হবে ফিলি'র ডোমেস্টিক বিমানবন্দরের দিকে।

সুন্দরী জ্যানেটের সাথে হাত মিলিয়ে বললাম, "গুডবাই 'জ্যান'... বলেই মনে হল, বাহ! জ্যানেটের ডাকনাম'টি তো ভালই দিলাম... আর ফ্লোরিডা... সে তো একদিক থেকে ভালই হল... আমার ভল্লুক মার্কা সোয়েটার দুটি তো আর পড়তে হবেনা। আমার কাছে একদিনের দেখা ফিলি তখন একপলকেই অতীত। চোখের সামনে আচমকা ভেসে উঠেছে ফ্লোরিডা'র পাল্ম কোস্টের থেকে মাত্র চল্লিশ মিনিট দুরত্বে আমার অনেককালের স্বপ্নের 'ডেটোনা বিচ'।

ডেটোনা'র স্বপ্ন দেখতে দেখতে পেন সেন্টার ছেড়ে যখন রাস্তায়ে পা রেখেছি, আমেরিকার ঘড়িতে তখন দুপুর আড়াইটে। একটু আগেই সামান্য তুষারপাত হয়ে গিয়েছে বোধহয়। আর ফিলির থেকে সাড়ে নয় ঘন্টা দূরে, বালিগঞ্জের বাড়ী'তে তখনও আমার মায়ের দুচোখে ঘুম আসেনি... ছেলেটির পৌঁছসংবাদ আসেনি কিনা..

ক্রমশ...